সত্যের প্রকাশ

সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরি (রহঃ)

সাধনা যখন মানুষের মনোজগৎকে আলোকিত করে তখন সে অবাক বিস্ময়ে দেখে তার সামনে এক সীমাহীন বিশ্বের দুয়ার উন্মুক্ত হয়ে গেছে।

সূফী

ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক একটি সংকলন

মাঘ ১৪২২, জানুয়ারি ২০১৬, রবিউল আউয়াল ১৪৩৭

** প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ প্রণীত হযরত সৈয়দ রশীদ আহমদ জৌনপুরির (রহঃ) সঙ্গে ধর্ম ও দর্শনকেন্দ্রিক কথোপকথন "সংলাপ সমগ্র" গ্রন্থটি পুনরায় ধর্ম ও দর্শন বিষয়ক সংকলন 'সূফী'-তে ধারাবাহিক ছাপা হচ্ছে। তাঁর (প্রফেসর হারুন-উর-রশিদ) সদয় অনুমতি নিয়েই আপনাদের সামনে আবার 'সংলাপ'গুলো প্রকাশ করা হচ্ছে। **

মৃত্যুহীন প্রাণ এবং অস্বীকারের মৃত্যু

আতা : আপনি সেদিন বলেছিলেন মানুষ চিরঞ্জীব, মানুষের মৃত্যু নেই। কথাটা ঠিক বুঝে উঠতে পারিনি হুজুর।

গুরু : মৃত্যু হচ্ছে আল্লাহ এবং তাঁর বান্দার মধ্যে একটা ঝিল্লিসম পর্দা বিশেষ। পর্দাটা সরে গেলেই মানুষ চলে যায় তার গন্তব্যে– মাটির দেহটা পড়ে থাকে পেছনে। সে জন্যই মৃত্যুকে আমরা ইন্তেকাল বা স্থানান্তর গমন বলি, হিন্দুরা বলে পরলোক গমন। কুরআনে বলা হয়েছে প্রত্যেক মানুষই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, মরবে একথা বলা হয়নি। কিন্তু তার আগে প্রশ্ন করা উচিত, মানুষ হয়ে মরে ক'জন।

আতা : হুজুর, 'জন্মিলে মরিতে হয়' এই তো নিয়ম– এর মধ্যে আবার মানুষ হবার প্রশ্ন কেন?

গুরু : মানুষ মানুষ হয়ে জন্মগ্রহণ করে ঠিকই– কিন্তু সব মানুষ মানুষ হয়ে মরে না। মানুষের জন্ম মাসুমিয়াত বা নিষ্পাপ অবস্থার মধ্যে। কিন্তু তার মধ্যে বড় হবার সঙ্গে সঙ্গে নফস এবং রুহের দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। যে মানুষ নফস বা প্রবৃত্তির দাস হয়ে তার স্রষ্টাকে বিস্মৃত হয় তার মধ্যে মনুষ্যত্বের কী বা অবশিষ্ট থাকে? এমন মানুষের মৃত্যুর সঙ্গে একটা পশুর মৃত্যুর তফাৎ কী বলো। সে জন্যই বললাম মানুষ হয়ে মরে ক'জন। যাঁরা মানুষ হতে পারে, তাঁদের মৃত্যু নেই। তাঁরা আল্লাহর চিরঞ্জীব সত্তায় বিলীন হয়ে যায়।

আতা : এ ধরনের মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য কী?

গুরু : এ ধরনের মানুষের সবচেয়ে বড় ফিতরত বা চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তাঁর ইমান।

আতা : হুজুর, ইমানের কথা তো সবাই আমরা মুখে উচ্চারণ করি।

গুরু : না, শুধু উচ্চারণ করার নাম ইমান নয়। ইমান হচ্ছে প্রগাঢ় বিশ্বাস তাঁর একক চিরঞ্জীব সত্তায়। বিশ্বাস তাঁর রাসুলে (সা.)– যিনি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের জন্য রহমতস্বরূপ। কিন্তু এ বিশ্বাসের প্রধানতম সিফত বা গুণ হচ্ছে সবর বা ধৈর্যধারণ করা। পার্থিব জীবনে সুখ যেমন তাঁর অনুগ্রহ– দুঃখও তেমনি তাঁরই অনুগ্রহ– এমন একটা অটল বিশ্বাসে যারা অবিচল চিত্তে জীবনের মুখোমুখি হন, তারাই সবরকারী। এদের জন্য কোনো বিশেষ পুরস্কারের আশ্বাস দেয়া হয়নি। আল্লাহ স্বয়ং এদের পুরস্কার অর্থাৎ আল্লাহ নিজেই এদের হয়ে যান। নবীদের জীবনের দিকে তাকিয়ে দেখলে দেখা যাবে সবরই তাঁদের চরিত্রের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য। হযরত ইফসুফ (আ.) কারাগারে গিয়ে অধৈর্য হননি। হযরত ইউনুস মাছের পেটে গিয়ে আল্লাহর ওপর বিশ্বাস হারাননি। প্রত্যেক নবীই অসীম নিগ্রহ ভোগ করেছেন মানুষের হাতে, কিন্তু তাঁরা সবাই অবিচল চিত্তে সব যাতনা সয়েছেন। হযরত ঈসা (আ.) বলেছেন, কেউ এক গালে চড় দিলে অন্য গাল বাড়িয়ে দিও। এখানেও সবরের কথাই বলা হচ্ছে। কিন্তু সবরের মর্যাদা যেমন উচ্চে তেমনি এর পরীক্ষাও অতি কঠিন। আল্লাহ এ ধরনের বান্দাকে প্রভূত পার্থিব অনুগ্রহ দিয়ে আবার তার সর্বস্ব হরণ করেও পরীক্ষা করেন। আল্লাহ নিজেই বলছেন– ওয়ালা নাবলুওয়ান্নাকুম বিশাইয়িম মিনাল খাওফে ওয়াল জু' য়ে ওয়া নাফক্বিম মিনাল আমওয়ালে ওয়াল আনফুসি ওয়াস সামারাত [২/১৫৫]– অর্থাৎ আমি তোমাদের ভয়, ক্ষুধা এবং ধনসম্পদ, জীবন ও ফল-ফসলের ক্ষয়ক্ষতি দিয়ে পরীক্ষা করবো। একই সঙ্গে আল্লাহ শুভ সংবাদ দিচ্ছেন ধৈর্যশীলদের যারা যে কোনো অবস্থাতেই আল্লাহর ইচ্ছাকে সর্বান্তকরণে মেনে নিয়ে বলে আমরা তো তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তন করবো।

আতা : আল্লাহর ইচ্ছার কাছে যে আত্মসমর্পণ করে তার তো চাইবার কিছু থাকে না একমাত্র স্বয়ং আল্লাহকে ছাড়া।

গুরু : তুমি ঠিক বলেছো। সে জন্যই ধৈর্যশীলদের পুরস্কার প্রসঙ্গে আল্লাহ সুরা নাহলের ৯৬ নং আয়াতে বলেছেন– মা ইনদাকুম ইয়ানফাদু ওমা ইন্দাল্লাহে বাক্বু ওয়ালা নাজযিইয়ান্নাল্লাজিনা সাবারু আজরাহুম বিআহসানে মাকানু ইয়া মালুন– অর্থাৎ তোমাদের কাছে যা আছে তা নিঃশেষ হয়ে যাবে কিন্তু আল্লাহর কাছে যা আছে তা চিরস্থায়ী। নিশ্চয়ই আমি ধৈর্যশীলদের তাদের কাজ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেবো।

আতা : কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ এই সবরের মোকাম হাসিল করতে পারবো না। আমরা তো গুনাহ করছি– হরদম করছি। শান্ত চিত্তে তাঁর ইচ্ছাকে মেনে নিতে পারছি কোথায়?

গুরু : সে জন্যই বলা হয়েছে নিরাশ হয়ো না। নিরাশ হওয়াটা কুফরির শামিল (সুরা ইফসুফ, আয়াত নং ৮৭)। দেখো, তোমরা গুনাহ বলতে কী বোঝো জানি না। আসলে আমি বোধহয় সওয়াব-গুনাহ কোনোটাই বুঝি না। তবে গুনাহ জিনিসটাকে সামান্য বোঝার চেষ্টা করে যেটুকু বুঝেছি তাতে মনে হয় মানুষের দেহের সঙ্গে এর একটা তুলনা চলে। দেখবে তোমার দেহ এমন কিছু গ্রহণ করে না যা তোমার দেহের প্রকৃতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। এমন রক্ত তোমার জন্য মৃত্যুর সমান। এমন খাদ্য তোমার দেহ গ্রহণ করবে না যা তোমার দেহযন্ত্রের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নয়। তেমন খাদ্য তোমার জন্য বিষ। মানুষের দেহের যেমন কিছু অ্যান্টিজেন বা বিষবৎ কিছু তৈরির শক্তি আছে, মানুষের আত্মারও তেমনি কতোগুলো বৈরী শক্তি আছে। এই বৈরী শক্তিগুলোকে আত্মা গ্রহণ করতে রাজি হয় না। কিন্তু আত্মার ইচ্ছার বিরুদ্ধে যখন তা গ্রহণ করা হয় তখন আত্মা রোগগ্রস্ত হয়– এরই নাম গুনাহ। দেহের ক্ষেত্রে একে আমরা বলি অসুস্থতা। দেহ অসুস্থ হলে ডাক্তারের কাছেন দৌড়াই। কিন্তু আত্মা অসুস্থ হলে নিজের কাছে নিজেই তা স্বীকার করি না। কিছু লোক মনে করে জীবন তো পড়েই আছে– একবার তওবা করে নিলেই চলবে। এতো তাড়াতাড়ি কিসের। কিন্তু এদের জীবনের শেষে তওবা আল্লাহ কবুল করবেন না। আল্লাহতায়ালা স্পষ্ট বাক্যে বলছেন– তওবা এদের জন্য নয়। কিংবা তওবা তাদের জন্যও নয় যারা কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে (৪/১৮)।

আতা : কাফেররাই তো কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। সুতরাং তাদের আবার তওবা কিসের?

গুরু : ভুল করছো আতা– কোনো কোনো মুসলমানও কাফের অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে পারে। ইমান যার নেই তাকেই তো আমরা কাফের বলি, তাই না। রাসুলে পাক (সা.) সত্তর রকম কবিরা গুনাহর কথা উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে সতেরটি কবিরা গুনাহ আছে যা করলে ইমান থাকে না। তওবা করে কালেমা না পড়লে সে কাফেরই থেকে গেলো এবং এ অবস্থায় মৃত্যু হলে সে তো কাফের হয়েই মরলো।

আতা : হুজুর, এ সতেরটি গুনাহ কী?

গুরু : এ গুনাহগুলোর কিছু আমরা ক্বালব দিয়ে করি, কিছু করি জবান বা মুখ দিয়ে, কিছু হাত দিয়ে, কিছু গোপন অঙ্গ দিয়ে। এগুলো হচ্ছে–

১. আল্লাহকে অস্বীকার করা। ২. অনুতপ্ত না হয়ে একই গুনাহ বারেবারে করা। ৩.আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হওয়া। ৪.আল্লাহর গজবের পরোয়া না করা। ৫.মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। ৬.কোনো নিষ্পাপ মহিলার চরিত্রে কলঙ্ক আরোপ করা। ৭. মিথ্যা কসম খাওয়া। ৮. জাদুটোনা, তাবিজ দিয়ে কারো ক্ষতি করা। ৯. মদ্যপান করা– যতোক্ষণ নেশা থাকে ততোক্ষণ ইমান থাকে না। ১০. এতিমের হক মারা। ১১. সুদ খাওয়া। ১২. নিজের গোপনাঙ্গের হেফাজত না করা। ১৩. সমকামিতায় অংশগ্রহণ করা। ১৪. নিজের পুরুষত্ব নষ্ট করে ফেলা। ১৫. কাউকে হত্যা করা। ১৬. চুরি করা। ১৭. সন্তানের পক্ষে বাবা-মার মনে কষ্ট দেয়া।

ওপরের এ কাজগুলোর প্রত্যেকটির ক্ষেত্রে কাজ করার এরাদা বা ইচ্ছা করার মুহূর্ত থেকে কাজ সম্পন্ন হবার পর তওবা না করা পর্যন্ত একজন বিশ্বাসীরও ইমান থাকে না। সুতরাং এ অবস্থায় মৃত্যু হলে মুসলমান বলে পরিচিত ব্যক্তিও কাফেরের মৃত্যুবরণ করলো। কিন্তু আল্লাহ কতো মেহেরবান তা আমরা সজ্ঞানে উপলব্ধি করি না। সত্যিকারের তওবা করে যে সৎপথে চলার চেষ্টা করে এবং বড় গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার চেষ্টা করে আল্লাহ না চাইতেই সে বান্দার ছোটখাটো গুনাহ মাফ করে দেন (৪/১৭)।

সুতরাং এসো আবার মানুষের দেহের উপমাটায় ফিরে আসি। গুনাহ যদি দেহের অসুস্থতার মতোই আত্মার অসুস্থতা হয়– তবে তওবা হবে রোগগ্রস্ত আত্মার জন্য ওষুধ স্বরূপ। আত্মা রোগমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত সবর হাসিল করা যায় না– ঠিক যেমন দেহ রোগমুক্ত না হলে সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া যায় না। আধ্যাত্মিক জগতে সবরই হচ্ছে সুস্বাস্থ্যের লক্ষণ। স্রষ্টাকে সকল কাজের নিয়ামক শক্তি হিসেবে সর্বান্তকরণে মেনে নেবার নামই সবর। এই মেনে নেবার নিরন্তর সংগ্রামের নামই হচ্ছে আধ্যাত্মিক সাধনা।

ইসলাম / মুহাম্মদ আলমগীর

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

আজকাল মার্কিন সাহিত্যে anti-hero বা দুষ্ট-নায়ককে গৌরবান্বিত করা হচ্ছে। সে মিথ্যা কথা বলে। সে ভয়ঙ্কর প্রকৃতির ধ্বংসযজ্ঞ চালায়। সে প্রচলিত নায়কের সম্পূর্ণ বিপরীত। সব রকম জঘন্য কাজ করে সে গর্ববোধ করে। তার অসুরের মতো ব্যক্তিত্বকে সবাই নম-নম করে। যুবক সমাজ মনে করে যে তাকে অনুকরণ করার মধ্যে একটা তৃপ্তি পাওয়া যায়, বাঁধনহারা হওয়া যায়। মোটকথা, সকল ভালো কাজের বিরোধিতা করে তারা বীরত্বের স্বাদ পেতে চায়। আজ সর্বত্রই নতুন প্রজন্মের উন্মাদ দেহভঙ্গিমায়, ভাষার উগ্রতায় এবং নিয়ম-কানুনের প্রতি তাচ্ছিল্যের মধ্যে এই anti-hero-র অশুভ প্রভাব দেখা যায়।

মানুষ যখনই মনে করে যে একটা বড় শক্তি তাকে নজরে রেখেছে, তখনই সে অশ্লীল ও অশুভ কাজ থেকে বিরত থাকে। ধর্মকে একবার বাদ দিলে, আর নিজের খেয়ালখুশি মতো কাজ করলে, ব্যক্তি এবং সমষ্টির জীবনে নৈরাজ্য আসতে বাধ্য। কুরআনে একথাই স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে। ইতিহাসে দেখা যায় যারা আল্লাহকে অমান্য করেছে, কোনো না কোনো দৈব বিপর্যয়ে তাদের নির্মূল করে দেয়া হয়েছে। আসলে তারা নিজেদের ধ্বংস নিজেরাই ডেকে এনেছিল। অনুরূপভাবে আজকের বৃহৎ শক্তিগুলো নিজেদেরই ধ্বংস করবে। সাইক্লোন, সুনামি, ভূমিকম্প, মহামারী ইত্যাদি নিজ নিজ নিয়মে তো আসতেই থাকবে, কিন্তু যে আধুনিক অস্ত্রসম্ভার হাতে নিয়ে এরা হুঙ্কার দিয়ে চলেছে, সেটাই এদের অস্তিত্বকে মুছে ফেলার জন্য যথেষ্ট হবে। এই আত্মবিনাশের কাজে তাদের প্রথম পদক্ষেপই হলো নৈতিক নীতিমালাকে ধ্বংস করে দেয়া। সেই লক্ষ্যে কৃতকার্য হবার পর তারা একে অন্যেকে ছিঁড়ে খাবে। এছাড়া আর কোনো কাজ তাদের থাকতে পারে না।

এই দুর্দশা সকলের জন্যই অপেক্ষা করছে। প্রাচ্য ও মুসলিম দেশগুলোও এই দিকে অগ্রসর হচ্ছে। তাদের অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক নয়। সেখানেও নৈতিকতাকে ধর্ম থেকে আলাদা করার পরামর্শদাতাদের অভাব নেই। তারা বিরাট ভুল করছে। নৈতিকতার শিকড় ধর্মের মধ্যেই নিহিত রয়েছে, এই কথাকে গায়ের জোরে দাবিয়ে রাখা যাবে না। আর তা যদি করা হয়, তাহলে পুষ্টিশূন্য হয়ে নৈতিকতা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। তারই সাথে হারিয়ে যাবে নৈতিক অনুভূতিও। মানুষ হয়ে যাবে উগ্র ও হিংস্র পশুর মতো। কে কাকে গিলে ফেলতে পারে, এটারই প্রতিযোগিতা তখন মুখ্য হয়ে যাবে। সত্যি কথা কি, এই অবস্থার সকল উপকরণ বর্তমান বিশ্বে পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছে।

অতএব আমাদের বদলাতে হবে। ঘুরে দাঁড়াতে হবে। কুরআনের কাছে ফেরত যেতে হবে। আমরা জানি, এমন কোনো নৈতিক সংজ্ঞা বা শিক্ষা নেই যা কুরআনে বর্ণনা করা হয়নি। আল্লাহ বলেছেন, আমি তোমাদের কাছে নবীদের পাঠিয়েছি, তোমাদের উচিত হবে তাদের বিশ্বাস করা আর তাদের কথা মতো চলা। তিনি বলেছেন, সকল মানবগোষ্ঠীকে এভাবেই শিক্ষা দেয়া হয়েছিল, কাজেই ভালো কাজে পরস্পরের সঙ্গে (অর্থাৎ, বিভিন্ন ধর্মের লোকদের সাথে) প্রতিযোগিতা করো। ভালো কাজ কে করেছে আর কে করেনি, সেটা তিনি পরকালে জানাবেন। তিনি মহানবী (সা.)-কে সর্বোত্তম শিক্ষা দিয়ে পাঠিয়েছেন, তাই আমাদের উচিত হবে একমাত্র তাঁকেই অনুসরণ করা। আর বিশেষভাবে স্মরণ রাখতে হবে যে, স্রষ্টা হিসেবে আল্লাহ হলেন সকল সৃষ্টজগতের পালনকর্তা বা রব (রাব্বুল 'আলামিন رَبُّ الْعٰلَمِيْنَ), আর মহানবী (সা.) হলেন সকল সৃষ্টজগতের জন্য করুণা বা রহমত স্বরূপ (রাহমাতুল লিল-'আলামিন رَحْمَةٌ لِّلْعٰلَمِيْنَ)। তারপরেও যদি কেউ হিন্দু হয়ে থাকতে চায়, বা খ্রিস্টান হয়ে থাকতে চায়, সেটা তার ইচ্ছা। সে তার কাজ করুক, আর আমরা মহানবী (সা.)-এর শিক্ষা অনুযায়ী কাজ করে যাবো। বিচার করার অধিকার আল্লাহর হাতে।

এই পৃথিবীতে পরিবর্তন একটা স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এখানে সবকিছুরই শুরু হয় একটা ছোট আকারে। তারপর সেটা ধীরে ধীরে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে যায়। তারপর সেটা ক্ষয়প্রাপ্ত হতে থাকে এবং শেষে বিলীন হয়ে যায়। সবকিছুর মধ্যে রয়েছে এই উর্ধ্বগমন আর অধঃগমন, বা উত্থান আর পতন, বা দৃশ্যধারণ আর অদৃশ্য হওয়া, বা জন্ম আর মৃত্যু। এই একই সত্য দেখা যায় মানুষের জীবনে, একটা বীজের জীবনে, একটা জনগোষ্ঠীর জীবনে। এটাই দুনিয়ার নিয়ম। বীজকে মাটির মধ্যে দিলে সেখান থেকে চারা ফুটে বাহির হয়। তারপর সেটা গাছে পরিণত হয়ে ফুল ফল ইত্যাদি উৎপাদন করে। তারপর এক সময় আর খাদ্য গ্রহণ করতে পারে না, আস্তে আস্তে শুকিয়ে যায়, মরে যায়। কিন্তু রেখে যায় অনেক ডাল, পাতা আর বীজ। ধর্মের শুরুটাও হয়েছিল একটা বীজের মতো এবং বহু শতাব্দী পরে আজকের ইসলামের মধ্যে সেটা পূর্ণতা অর্জন করেছিল। এর ফুল, ফল ও সৌন্দর্য চূড়ান্তভাবে বিকশিত হবার পর এর মধ্যেও ভাঙনের আভাস দেখা দিয়েছে। স্বভাবতই সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিভঙ্গিতে এই অবস্থা খুবই হতাশাব্যঞ্জক এবং এই হতাশার ওপর ভর করে শেষ আঘাত হানার জন্য ইসলামের শত্রুরা চারদিক দিয়ে আক্রমণ চালিয়ে যাচ্ছে। তারা আমাদের বুঝাচ্ছে যে Islam is a spent force, অর্থাৎ ইসলাম একটি নিঃশেষিত শক্তি। তবে, সমাজবিজ্ঞানে আলোচিত উত্থান-পতনের সূত্র যাই বলুক না কেন, আল্লাহ বলছেন: তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন যদিও কাফেররা তা অপছন্দ করে।

আমাদের সামনে আজ প্রশ্ন একটাই– আমরা কি সেই ভাঙনকে ত্বরান্বিত করছি, নাকি সেটার মোড় ঘুরিয়ে দিয়ে ইসলামকে আরো উচ্চতায় নেয়ার কাজে অংশ নিচ্ছি। ইসলামের প্রতি আমাদের কী দায়িত্ব, সে ব্যাপারে যদি আমরা মনস্থির করতে না পারি তাহলে মনে রাখতে হবে যে, আল্লাহ বলেছেন: তোমরা সন্দেহপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না। নানা ধরনের সন্দেহের কারণে আমরা নৈতিক মনোবল হারিয়ে ফেলছি। কিন্তু বসে থাকলে কোনো সমাধান হবে না। ধর্মশিক্ষা দেয়া আর ধর্মপ্রচার করা আমাদের সকলের কাজ। এটা মাটিতে বীজ ছড়ানোর মতো। সেই বীজ উর্বর মাটিতে পড়তে পারে, নাও পড়তে পারে। এটা ঠিক যে, কাউকে এই শিক্ষা জোর করে গেলানো যায় না। তবে, যদি কেউ সুবোধ হয়, ভালো কথা; যদি না হয়, তাহলে নতুন করে চেষ্টা করতে হবে। এছাড়া করার কিছুই নেই। খ্রিস্টান ধর্মও এই রকম প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হয়েছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে তারা বড় ধরনের নৈতিক আন্দোলনের উদ্যোগ নিয়েছিল, যাকে খ্রিস্টান Fundamentalism বা খ্রিস্টান মৌলবাদ বলা হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা তাদের শিক্ষা থেকে ছিটকে পড়েছে। বিগত তিনশ বছরের ইতিহাসের সারকথা হলো এই যে, একদিকে রাজনৈতিক আধিপত্য খ্রিস্টান সমাজকে বেপরোয়া করে তুলেছে, আর অপরদিকে রাজনৈতিক দাসত্ব মুসলিম সমাজকে আস্থাহীনতায় জর্জরিত করে ফেলেছে।

এই অবস্থায় আমাদের ধর্মীয় শিক্ষকরা নৈতিক দৃঢ়তার ওপর সঠিক পরিমাণ জোর দেননি। তারাও খ্রিস্টানদের অনুকরণে মৌলবাদের পথ ধরেন। ধর্মের বাহ্যিক আচার-অনুষ্ঠানের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিষয়ের ওপর তারা বেশি জোর দিতে লাগলেন, ঠিক যেমন করেছিলেন ঈসা (আ.)-এর সময় Pharisees বা ফরিশিরা। ঈসা (আ.) এটাকে তুলনা করেছেন কবরকে চুনকাম করার সাথে। ওপর থেকে কবরকে যতোই ধবধবে সাদা করে রাখা হোক না কেন, ভেতরে তো পচা হাড় ছাড়া আর কিছুই থাকে না। এই দুরবস্থা আজ সর্বত্র। এবাদত-বন্দেগি কড়ায়-গণ্ডায় পুরো করা হচ্ছে, কিন্তু ভেতরের পচন যাচ্ছে না। এর কারণ, আমরা নামাজের আসল উদ্দেশ্য নিয়ে চিন্তা করছি না। নামাজ ও অন্যান্য এবাদত নৈতিক উৎকর্ষ সাধনে সাহায্য করে। যেমন বলা হয়েছে: নিঃসন্দেহে নামাজ অশালীনতা ও অন্যায়াচরণ থেকে বিরত রাখে। দেখতে হবে সেটা হচ্ছে কিনা। ■

মুহাম্মদ আলমগীর: ১৯৪২ সালে কলকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত তিনি করাচিতে শিক্ষা জীবন এবং প্রাথমিক কর্মজীবন কাটান। ষাটের দশকে তিনি মরহুম মওলানা ফজলুর রহমান আনসারী (রহ.) এবং মরহুম ড. বুরহান আহমদ ফারুকী (রহ.)-এর সান্নিধ্যে তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদিতে শিক্ষালাভ করেন। এই লেখাটি তাঁর **কুর'আন সম্মত মুসলিম জীবন** গ্রন্থ থেকে নেয়া হয়েছে।

ঈদে মিলাদুন্নবীর গুরুত্ব ও তাৎপর্য

মোহাম্মদ মাকছুদ উল্লাহ

১২ রবিউল আউয়াল, ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.), বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর ১৪৪৫তম বেলাদাত ও ১৩৮৩তম ওফাত দিবস। দিনটি সমগ্র বিশ্বের মুসলমানদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ। ৫৭০ খ্রিস্টাব্দে ২৯ আগস্ট, রবিউল আউয়াল মাসের ১২ তারিখ সোমবার, সূর্যোদয়ের ঠিক পূর্ব মুহূর্তে, সুবহে সাদিকের সময় মহাকালের এক মহাক্রান্তিলগ্নে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। আবার তেষট্টি বছরের এক মহান আদর্শিক জীবন অতিবাহিত করে ৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ৮ জুন, ১১ হিজরি রবিউল মাসের ১২ তারিখ একই দিনে পরলোকগমন করেন। দিনটি মুসলিম সমাজে ইদে মিলাদুন্নবী (সা.) নামে সমধিক পরিচিত। ঈদ, মিলাদ আর নবী তিনটি শব্দযোগে দিবসটির নামকরণ হয়েছে। ঈদ অর্থ– আনন্দোৎসব, মিলাদ অর্থ– জন্মদিন আর নবী অর্থ নবী বা ঐশী বার্তাবাহক।

তাহলে ঈদে মিলাদুন্নবীর অর্থ দাঁড়ায় নবীর জন্মদিনের আনন্দোৎসব। ১২ রবিউল আউয়াল একই সাথে মহানবীর জন্ম ও মৃত্যুদিবস হলেও তা শুধু জন্মোৎসব হিসেবেই পালিত হয়। পৃথিবীর যেকোনো মানুষের মৃত্যুই তার পরিবার, সমাজ ও দেশের জন্য বিরাট শূন্যতা সৃষ্টি করে। কিন্তু মহানবীর মৃত্যু মানবসমাজ ও সভ্যতার কোনো পর্যায়ে কোনো শূন্যতার সৃষ্টি করেনি। যদিও তাঁর মৃত্যুর চেয়ে অধিক বেদনাদায়ক কোনো বিষয় উম্মতের জন্য হতে পারে না। তিনি প্রেরিত হয়েছিলেন সমগ্র পৃথিবীর জন্য আল্লাহর রহমত হিসেবে। এরশাদ হয়েছে, 'আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্বের জন্য রহমত হিসেবে প্রেরণ করেছি।' (সুরা আল-আম্বিয়াঃ ১০৭)। এরশাদ হয়েছে, 'আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের জীবন বিধানকে পরিপূর্ণ করে দিলাম, তোমাদের ওপর আমার নেয়ামতরাজিকে পূর্ণতা দিলাম আর ইসলামকে তোমাদের একমাত্র জীবন বিধান হিসেবে মনোনীত করলাম।' (সুরা আল-মায়িদাঃ ৩)।

রবিউল আউয়াল মাস এলে মুসলিম সমাজে মিলাদ মাহফিল ও সিরাত মাহফিল আয়োজনের ধুম পড়ে যায়। কিন্তু রাসুলুল্লাহ (সা.) যে আদর্শের সুষমা দিয়ে একটি বর্বর জাতিকে আদর্শ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন, জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরির মতো ফুটতে থাকা একটি সমাজকে শান্তির সুশীতল ছায়াতলে এনে দিয়েছিলেন; সেই মহান আদর্শে উত্তরণের কোনো চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। মহানবীর আদর্শ অনুসরণ না করে শুধু মিলাদ মাহফিল আর সিরাত মাহফিল আয়োজনে কোনো লাভ নেই। কারণ মহান আল্লাহ রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শকে জীবনে ধারণ করার নির্দেশ দিয়েছেন। এরশাদ হয়েছে, 'হে রাসুল! আপনি বলে দিন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবেসে থাকো তাহলে আমাকে অনুসরণ করো, আল্লাহতায়ালা তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু।' (সুরা আল-মায়িদাঃ ৩১)। রাসুলুল্লাহ (সা.) চারিত্রিক শ্রেষ্ঠত্বের মাধ্যমেই একটি শ্রেষ্ঠ জাতি গঠন করেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আমর (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– 'নিশ্চয়ই আমি সর্বোত্তম চরিত্রের পূর্ণাঙ্গতা সাধনের জন্য প্রেরিত হয়েছি।' (ইবনে মাজা)। রাসুলুল্লাহ (সা.)-এর আদর্শ ধারণ করেই সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যুগের সর্বোত্তম মানুষ হতে পেরেছিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– 'সর্বোত্তম মানুষ হলো আমার যুগের মানুষ, অতঃপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ, তারপর তাদের পরবর্তী যুগের মানুষ।' (সহিহ বোখারি)।

আজ আমাদের সমাজে মিলাদ-কিয়াম নিয়ে দ্বন্দ্ব আর দলাদলির শেষ নেই। রাসুলকে ভালোবাসার দাবিদার সবাই। কিন্তু এক পক্ষের প্রতি অন্যপক্ষের নিকৃষ্ট সব উক্তিতে রাসুলের প্রতি ভক্তি আর ভালোবাসার বিন্দুমাত্র চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। ভণ্ড, বিদ'আতি, ওহাবি, ফাসেক, কাফের– বিভিন্ন আখ্যায় একে অন্যকে আখ্যায়িত করে ফেরকাবাজি আর সামাজিক বিভাজনকে বাড়িয়েই চলেছেন রাসুল-প্রেমিকরা। মাঝেমধ্যে বিরোধ সংঘাতে গড়াচ্ছে, এমনকি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও হত্যাকাণ্ডের মতো জঘন্য ঘটনাও ঘটছে। যে রাসুল তাঁর জীবনে শত্রুর প্রতি কোনোদিন রূঢ়বাক্য নিক্ষেপ করেননি, আজ তাঁর ভালোবাসার দাবি যে মুখ থেকে উচ্চারিত হচ্ছে সে মুখটাই অন্য মুসলমানের রক্তের পিপাসায় অধীর! হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা.) একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– 'কোনো মুসলমানকে গালি দেওয়া ফাসেকি আর তাকে হত্যা করা কুফরি। (বোখারি-মুসলিম)। হযরত আবু জার গিফারি (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) বলেছেন– 'যখন কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তির প্রতি ফাসেকি বা কুফরির অপবাদ নিক্ষেপ করে তখন অভিযুক্ত ব্যক্তি তার উপযুক্ত না হলে অপবাদ নিক্ষেপকারীর দিকে তার অপবাদ ফিরে আসে।' (সহিহ বোখারি)।

রাসুলুল্লাহ (সা.) গোত্রীয় শাসনের স্বৈরাচারে দগ্ধ, মুষ্টিমেয় বিত্তশালীর শোষণে নিঃস্ব, সামাজিক দুরাচারে অতিষ্ঠ মানুষের মুক্তির স্বপ্ন দেখেছিলেন। তিনি বঞ্চিত মানুষের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে তাওহিদের বাণী প্রচারের দায়ে স্বজাতির নির্যাতনে নিরুপায় হয়ে জন্মভূমি ছেড়ে মদিনায় হিজরতে বাধ্য হয়েছিলেন। অতঃপর ঐতিহাসিক মদিনা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে ইহুদি, পৌত্তলিক, খ্রিস্টান ও মুসলমানদের নিয়ে মদিনাতে একটি স্বাধীন-স্বতন্ত্র জাতি ও সার্বভৌম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অল্প সময়ের ব্যবধানে রাসুল (সা.)-এর আদর্শিক জাগরণ সমগ্র আরব উপদ্বীপকে আয়ত্ত করে নিয়েছিল। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা, সামাজিক সুশাসন, অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। আজ যখন দেশের বিপুল মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে, যখন অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান-শিক্ষা-চিকিৎসার অভাব জনজীবনে প্রকট হয়ে উঠছে, যখন মানুষ একে অপরের দ্বারা নির্যাতিত ও অধিকার বঞ্চিত হচ্ছে, তখন ঈদে মিলাদুন্নবী (সা.)-এর প্রতিপাদ্য বিষয় হোক– রাসুল (সা.)-এর ভালোবাসার দাবিতে সংঘাত নয়, চাই রাসুল (সা.)-এর আদর্শের ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ।

লেখক: পেশ ইমাম ও খতিব, রাজশাহী কলেজ কেন্দ্রীয় মসজিদ

আত্মার গহিনে স্রষ্টার উপলব্ধি

শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি

** শেখ মুহাম্মদ সা'ঈদ আল-জামাল আর-রিফাই আস-সাজিলি (জন্ম ১৯৩৫ - পবিত্র ভূমি জেরুসালেম) হযরত মুহম্মদ (সা.) এর বংশধর এবং বর্তমানে সাজিলিয়া সুফি তরিকার মুর্শিদ। জেরুসালেমস্থ সুফি কাউন্সিলের তিনি প্রধান এবং দীর্ঘদিন মসজিদ আল-আকসার প্রধান শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী। তিনি বর্তমানে ফিলিস্তিনে বসবাস করেন এবং তার মুরিদদের জন্য আমেরিকায় ভ্রমণ ও অবস্থান করে থাকেন। **

(পূর্বে প্রকাশিতের পর)

খোদায়ী নুর স্রষ্টার তরফ থেকে আগমন করে রুহের ওপরে প্রবাহিত হলে তা যাবতীয় স্থূল এবং সূক্ষ্ম অবাধ্যতা থেকে আত্মাকে পবিত্র করার দাবি করতে থাকে। এই অবস্থায় রুহ বা আত্মা যে নামে পরিচিতি পায় তার নাম হলো আন নাফস আল মুতমায়িন্নাহ বা নিরাপদ ও প্রশান্ত আত্মা। কিন্তু তারপরেও সম্পূর্ণভাবে ঋজু না হওয়ার কারষে এবাদত-বন্দেগি করা সত্ত্বেও নফস কোনো না কোনো ভাবে গায়র-আল্লাহ বা আল্লাহ ভিন্ন অন্যের দিকে ঝুঁকে থাকে। এরপরে যখন স্রষ্টার নুর আরো প্রবাহিত হয় তখন তা বান্দার নিজস্ব পছন্দ ধ্বংস করতে থাকে এবং যাবতীয় দুনিয়ার অভ্যাস ও অভ্যস্ততা থেকে সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর দিকে মুখ ফেরাতে দাবি করে। এ পর্যায়ে নফসকে ডাকা হয় আন নাফস আল রাদিয়া বা সন্তুষ্ট আত্মা। যখন নফস সম্পূর্ণ শূন্য হয় এবং নফস নিজেকে দেখা থেকে মুক্তি পায় তখন স্রষ্টার সর্বোচ্চ নুর (আল ফায়াদ আল ইলাহি) প্রবাহিত হয়। আরিফবিল্লাহদের ভাষায় একে বলা হয় মহান উদ্বোধন (আল ফাত আল জাম)। এই পর্যায়ে আত্মার আলাদাভাবে নিজস্ব অনুভূতি এবং বোঝাবুঝি লুপ্ত হয় যার ফলে এক হক্ক ছাড়া আর সবকিছুর নাম, প্রকাশ, ছবি বিলুপ্তি পায়। ফলে মহাসত্য থেকে, মহাসত্যের জন্য মহাসত্যকেই একমাত্র ধারণ করা হয়। আরেফবিল্লাহদের ভাষায় একে বলা হয় ফানার ফানা। এর মাধ্যমে স্রষ্টার সন্তুষ্টি সম্পূর্ণ হয় এবং আত্মাকে এ পর্যায়ে ডাকা হয় আন নাফস আল মারদিয়া বা সম্পূর্ণ সন্তোষকারী আত্মা।

যখন স্রষ্টার সান্নিধ্য থেকে আত্মার ওপরে এই নুর প্রবাহিত হয় এবং আত্মার বিশেষ মর্যাদা প্রদানের পর আল্লাহ আত্মাকে সেই মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ গুণাবলির জ্ঞান এবং যা ন্যায়সঙ্গতভাবে এর হক তা জানাতে শুরু করে। যখন আত্মা এই জ্ঞানপ্রাপ্ত হয় এবং সেই পদমর্যাদার যাবতীয় সাধারণ ও বিশেষ কর্তব্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়ন সে পর্যায়ে এই আত্মাকে ডাকা হয় আন নাফস আল কামিলাহ্ বা বিশুদ্ধ আত্মা।

যখন স্রষ্টার সান্নিধ্যের নুর আত্মার ওপরে প্রবাহিত হওয়ার মাধ্যমে সকল মায়া ও বিভ্রম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় এবং ইন্দ্রিয় নির্ভর অভিব্যক্তি অপসারিত হয়, এবং নফসের বাহ্যিক ও অভ্যন্তরীণ– উভয় অবস্থাই এরূপ গুণ লাভ করে তখন আত্মার এই অবস্থাকে বলা হয় আল-কাফি বা নিগূঢ়।

যখন স্রষ্টার সান্নিধ্যের নুর আত্মার ওপরে প্রবাহিত হওয়ার মাধ্যমে ঠিক রাতের সাথে সূর্যরশ্মির যেরকম সম্পর্ক তেমনি আত্মার সাথে সর্বপ্রথম বিশুদ্ধতার সম্পর্ক তৈরি হলে এই অবস্থাকে বলা হয় সর্বোচ্চ লুক্কায়িত বা আল আকফা।

খোদায়ী গুণাবলির আবির্ভাব, চৈতন্য, বিশুদ্ধ জ্ঞান, লুক্কায়িত রহস্যসমূহ এবং উদ্বোধনের কারণে ঠিক এভাবে আত্মা একটির পর একটি সোপান পার হয় এবং উর্ধ্বারোহণ করতে থাকে। আকফার পরের মাকামটির নাম 'পরম মাকাম (ঃযব ংঃধঃরড়হ ড়ভ ঃযব সড়ংঃ বীঃৎবসব)', যার পরেরটিকে বলা হয় 'গুপ্ত রহস্যের মাকাম (ঃযব ংঃধঃরড়হ ড়ভ ঃযব ংবপৎবঃ)', তারপরে 'গোপনেরও গোপন (ঃযব ংবপৎবঃ ড়ভ ঃযব ংবপৎবঃ)' এবং এর পরেরটি 'গোপনের গোপনের গোপন (ঃযব ংবপৎবঃ ড়ভ ঃযব ংবপৎবঃ ড়ভ ঃযব ংবপৎবঃ)।' এই নামসমূহ আবার পরের মাকামগুলোতে পুনরুচ্চারিত হয় যতক্ষণ না উর্ধ্বারোহণ অসীমে উঠতে থাকে এবং পৌঁছে যায় মহাবিশ্বের মহাকাননে।

সাকার জগৎ (আলম আল মুলক) হলো সেই স্থান যেখানে স্রষ্টার গুণাবলি (সিফাত) প্রকাশিত এবং একে বলা হয় প্রত্যক্ষ বা সাক্ষ্য জগৎ (আলম আশ শাহাদা)। এই জগৎ স্থূল এবং ইন্দ্রিয়-নির্ভর অনুভবের মাধ্যমে পরিগণিত হয়। কিন্তু আলম আল মালাকুত হলো আরও সূক্ষ্ম জগৎ যার উর্ধ্বে জান্নাত, আরশ এবং কুরসির অবস্থান। সুতরাং স্থূল জগৎ সম্পর্কে জানতে হলে প্রয়োজন ইন্দ্রিয়ানুভূতি এবং সুস্থ বুদ্ধি, অন্যদিকে আধ্যাত্মিক জগতের সম্পর্কে জানতে প্রয়োজন ভিন্ন ধরনের ধীশক্তি, জ্ঞান এবং উপলব্ধি। আলম আল জাবারুত বা শক্তির জগৎ উপলব্ধি ও বোঝার জন্য প্রয়োজন সম্পূর্ণ ভিন্নমাত্রার অবস্থা। চতুর্থ যে জগৎ যা স্রষ্টার শক্তির জগৎ তা অপ্রকাশিত এবং তাতে যা রয়েছে তা সমগ্র জগতের বোঝার অতীত। এতে যা রয়েছে তা সৃষ্টির ধারণার বাইরে এবং এটি হলো স্রষ্টার জাতের তাজাল্লির জগৎ এবং সে জগতের বিবরণ ব্যাখ্যা দেওয়া বা তা বুত্ত আনা অসম্ভব।

আবু বকর (রা.) বলেছেন, 'চেতনাবোধ (পড়হংপরড়ঁংহবংং) যে বুঝতে পারা যায় না, এই ক্ষমতার নামই বোধশক্তি।' যতই সালিক মাকাম অতিক্রম করে পথ চলতে থাকে ততই তার প্রস্তুতি এবং গ্রহণ করার ক্ষমতা অনুযায়ী তার কাছে জাতের নুর প্রকাশিত হতে থাকে এবং সেই নুরের মাধ্যমে সে তার স্রষ্টাকে এবং সৃষ্টিকে চিনতে পারে। উর্ধ্বারোহণ করতে করতে সে যদি এক পর্যায়ে মনে করে যে তার সম্পূর্ণ জ্ঞান হয়ে গেছে তখন সে এমন এক মাকামে এসে উপস্থিত হবে যেখানে সে বুঝবে যে খোদার জাতের এমনই রূপ যে একে চেনা বা জানার সাধ্য কারো নেই। এই হলো সর্বোচ্চ মাকাম এবং এখানে যে উপস্থিত হবে তার মারেফত সম্পূর্ণ হবে। এই মাকামে বান্দার দোয়া হলো, 'হে আমার প্রভু আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করো, রাব্বি যিদনি ইলমান' (কুরআন ২০:১১৪) অথবা সে এই দোয়া করে থাকে 'হে আমার প্রভু, তোমার মধ্যে আমার বিহ্বলতা আরও বৃদ্ধি করো।'

হকের যে হাকিকত তা একমাত্র আল হক্ক বা আল্লাহ সুবহানাহুয়াতা'লা ছাড়া অন্য কেউ জানে না। (চলবে)

■ প্রধান সম্পাদক : প্রফেসর মোহাম্মদ হারুন-উর-রশিদ ■ নির্বাহী সম্পাদক : নিশাত বদরুল ■ অঙ্গসজ্জা : মেটাকেভ পাবলিকেশন্স ■ সৈয়দ রশীদ আহমদ মিশন ফাউন্ডেশনের পক্ষে সৈয়দ জুনায়েদ কে দোজা কর্তৃক ৯৪, নিউ ইস্কাটন, বাংলামটর, ঢাকা থেকে প্রকাশিত এবং জিনিয়াস প্রিন্টার্স ৪৬/১ পূর্ব তেজতুরী বাজার, ফার্মগেট, ঢাকা থেকে মুদ্রিত। প্রাপ্তিস্থান: বাইতুর রহিম জামে মসজিদ ও আয়েশা হোমিও দাতব্য চিকিৎসালয়, ১২২১/১ পূর্ব মনিপুর, মিরপুর ঢাকা।